BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 19-28

শওকত ওসমানের জীবনবোধ ও ছোটগল্পের প্রকাশ-কৌশল

মোঃ আল-মামুন কোরাইশী

সারসংক্ষেপ

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান একটি উজ্জ্বল নাম। শওকত ওসমান কথাসাহিত্যে তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্পদৃষ্টিতে বিশিষ্ট। তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয়-নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা ছোটগল্পে একটি পৃথক আসন দান করেছে। জীবনচলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবনের অসংখ্য চিত্র, সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিকরূপ ধারণ করেছে। তাঁর ছোটগল্প জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়কে আত্মস্থ করেছে। সন্ধানী পরিব্রাজকের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন। জাতীয় চেতনাবোধ,ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনবোধ থেকে উদ্ভাবিত প্রতিভা এবং তা প্রয়োগের সঠিক কৌশল, যেমন তাঁর প্রাগ্রসর জীবনচেতনাকে প্রতিভাসিত করেছে, তেমনি তাঁর গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে। আর বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রায়ণের কৌশল, স্বতন্ত্র ভাষারীতি এবং উপস্থাপনার সাবলীলতার কারণে শওকত ওসমানের গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো হয়ে উঠেছে শিল্পসফল ও শিল্পসমৃদ্ধ।

মোঃ আল-মামুন কোরাইশী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নরসিংদী সরকারি কলেজ
নরসিংদী, বাংলাদেশ
e-mail : lablu78@gmail.com

মূলশব্দ

জীবনানুভব, সমাজ রূপান্তর, ঔপনিবেশিক, অস্তিত্ব, পাকিস্তান, পূর্ববাংলা, মধ্যবিত্ত, বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধ

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলিত সময়ে বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্বের রূপায়ণ এবং পাকিস্তানি আমলে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববাংলার ওপর নির্যাতনের চিত্র শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পসমূহে কতটা সূক্ষ্মভাবে রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের পাঠ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

জীবনবাদী ও প্রকরণবাদী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একজন প্রাতিস্বিক প্রাগ্রসর শিল্পী। বাংলা ছোটগল্পের পটভূমিতে বাংলাদেশের ছোটগল্পে নতুন মাত্রা, নতুন অভিজ্ঞতার প্রান্ত উন্মোচন, জীবনানুভবকে ব্যক্ত করা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে শওকত ওসমানের কৃতিত্ব অপরিসীম। প্রতিটি সমাজের সমাজ রূপান্তরের একটি ধারাবাহিকতা থাকে। সমাজ বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতা কখনো সূক্ষ্মভাবে, কখনো বা বিস্তৃতভাবে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে যেমন এসেছে, তেমনি সময় ও সমাজের চলমানতায় প্রবাহিত তাঁর চরিত্রগুলো। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলিত সময়ে তাঁর আবির্ভাব হলেও তিনি বাস্তবতার শিল্পী। এজন্য বিবর্তনের মধ্যদিয়ে (ছয় দশকের) বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্বের যে রূপায়ণ তা তুলে ধরা হয়েছে অভিনব পদ্ধতির মধ্যদিয়ে। বিট্রিশ শাসনাধীন চল্লিশের দশকের প্রায় শেষাবধি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে মুসলমানরা ছিল বিপর্যস্ত ও নানা সঙ্কটে নিপতিত। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা ছিল তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির কারণে যে সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তার ভয়াবহ চিত্র রয়েছে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তা তিনি মর্মমূলে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশের ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান বিষয়ভাবনা, জীবনবৈচিত্র্যের রূপায়ণ ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একজন অসাধারণ শিল্পী। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে নব্বই এর দশক পর্যন্ত তিনি আমাদের কথাসাহিত্যকে বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন–

> সময় সমাজ ও ইতিহাসের নিবিড় শুশ্রূষায় তাঁর গল্পের জীবন বিমিশ্র। জীবনের বিচিত্র কল্লোল ও কোলাহলে তাঁর গল্পের মানুষেরা উচ্চকিত। সমাজ-চেতনা ও মানবিক চেতনা এই দু'য়ের সম্মিলিত প্রকাশ শওকত ওসমানের সৃষ্টি কর্মের সবচেয়ে পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্য।[১]

ঔপনিবেশিক ভারতের অবরুদ্ধ মৃত্তিকায় শওকত ওসমানের জন্ম। তাঁর শৈশব কেটেছে হুগলি জেলায়। যৌবনকাল ও শিক্ষাজীবন কেটেছে কলকাতায়। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। তিনি ১৯৪৭ উত্তরকালে অভিবাসী হিসাবে পূর্বপাকিস্তানে আসেন। তাঁর দীর্ঘজীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। ভারতবিভাগের পর অস্তিত্বের সংকটে পতিত হয়ে যখন অভিবাসন প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তখন ছিল মুসলিম লীগের সময়, পরবর্তীতে আসে যুক্তফ্রন্ট, তারপর তিনদফায় সামরিক শাসন আসে। এই পরাধীনতার সময় তাঁর ব্যাপক সাহিত্য সৃজিত হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধ, তারপর আনন্দ-অবকাশ ও পরবর্তীতে জাতির বিবেকে পরিণত হন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একটি বিরাট অভিঘাত সৃষ্টি করে। এই যুদ্ধ যেমন একদিকে ডেকে এনেছে

অনিবার্য ধ্বংস তেমনি অন্যদিকে অনেক আবিষ্কারকেও করেছে দ্রুত। আর এই মহাযুদ্ধের অভিঘাত শিল্প-সাহিত্যেও পড়েছে প্রবলভাবে। বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পে এই সময় নতুন এক সৃষ্টির জোয়ার আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালে আর শেষ হয় ১৯৪৫-এ। এর অব্যবহিত পরেই আরো এক বড় ঘটনা ঘটে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এই ভাগের প্রক্রিয়ায় পাঞ্জাব ও বাংলাও হয় দ্বিখণ্ডিত। পূর্ববাংলা পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। দুই বাংলায় স্থানান্তর চলে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে লাখ লাখ পরিবার একদিক থেকে আর একদিকে চলে যেতে থাকে। শুরু হয় নানারকম সংকট। দেশান্তরিতদের বলা হয় রিফিউজি। একটি নতুন মাত্রা যোগ হয় একাংশের জীবনে। এই রকম একটি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময় জন্ম নেয় একেবারে নতুন ধরনের এক সাহিত্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তখন সাহিত্য নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকের জন্ম দেয়। এই সময় যেসব সাহিত্যিক বিশেষভাবে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে আছেন সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সমরেশ বসু, গোলাম কুদ্দুস ও শওকত ওসমান।[২]

জীবনবোধের গভীরতায় শওকত ওসমানের গল্পে অবলীলায় উঠে এসেছে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তির পদতলে নিস্পিষ্ট সমাজ ও মানুষ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পে ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিপীড়ন, নারীনিগ্রহ ও নারী-নির্যাতন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে পরিস্ফুটিত। বিশ শতকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য ও ব্রিটিশের শাসন-শোষণের ভয়াবহতা, চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সর্বোপরি স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচার-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন– বাঙালি জাতীয় জীবনের এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শওকত ওসমানের ছোটগল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের গল্পের পর্যায় ও ধারাগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়–

প্রথম পর্যায়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে–

ক) *পিঁজরাপোল* (১৯৫০)
খ) *জুনু আপা ও অন্যান্য* (১৯৫১)
গ) *সাবেক কাহিনী* (১৯৫২)

দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলোতে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মধ্যদিয়ে শওকত ওসমান ছয় দশকের বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্ব রূপায়ণ করেছেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো–

ক) *উপলক্ষ্য* (১৯৬২)
খ) *প্রস্তরফলক* (১৯৬৪)
গ) *নেত্রপথ* (১৯৬৮)
ঘ) *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮)

তৃতীয় পর্যায়ে রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প গ্রন্থগুলো হলো–

ক) *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫)
খ) *মনিব ও তাঁর কুকুর* (১৯৮৬)
গ) *তিন মির্জা* (১৯৮৬)
ঘ) *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৯০)

তবে ১৯৬৪ সালের প্রস্তরফলক রচয়িতা শওকত ওসমান, পরিণত শওকত ওসমানের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন। অর্থাৎ ১৯৭১ পূর্ববর্তী শওকত ওসমান ও পরবর্তী শওকত ওসমানের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। প্রথম পর্যায়ে রচিত *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'পিঁজরাপোল' গল্পটি শোষক চরিত্রের ভন্ডামি ও মুখোশ উন্মোচক। ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিবাদের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে 'পিঁজরাপোল' গল্পে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। এ গল্পে মহারাজা পাণ্ডেরীরামের পিঁজরাপোল প্রতিষ্ঠার প্রতি লেখকের তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। মহারাজা পান্ডেরীরাম তার একটি গাভীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন, 'পিঁজরাপোল'– পশুরোগ ক্লেশ নিবারণী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখানে কর্মরত কেরানী ও রাখালদের পেটের ক্লেশ দূর করার ব্যবস্থা হয় না। উপরন্তু পশুদুঃখী পান্ডেরীরাম পাটকল শ্রমিকদের দাবী ঠেকানোর জন্য হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মতো গুলি চালানোর আদেশ দেয়। এ গ্রন্থের 'কাঁথা' গল্পে ছিন্ন কাঁথার রূপকে লেখক আমাদের ছিন্ন সমাজ ব্যবস্থারই চিত্র অঙ্কন করেছেন। অভাবের সংসারে সামান্য শীতবস্ত্র কিংবা কাঁথা-বালিস জোটানো, কি যে সমস্যা তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। দরিদ্র কৃষক লতিফের একমাত্র ছেলে মানু বাজারের থলি ছড়িয়ে শীত নিবারণ করে। বস্ত্রের অভাবে তার স্ত্রী কাঁথা জড়িয়ে বসে থাকে একমাত্র শাড়ী রৌদ্রে শুকাতে দিয়ে। লতিফের বাবার আমলের একটি কাঁথা ছিল। তার বাবা খাদেম আলী যক্ষারোগী ছিলেন। লতিফের স্ত্রী বরু বিবি শ্বশুরের ব্যবহৃত কাঁথাটি ছেলেকে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ। একদিন মাঠ থেকে এসে লতিফ দেখে বরু বিবি পুরাতন কাঁথাটি সেলাইয়ের উদ্দেশ্যে খুলে তার মধ্যে একটি নতুন শাড়ি আবিষ্কার করে। নতুন শাড়ি পেয়েও বরু বিবি কান্নাকাটি করে। কারণ ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে প্রাপ্ত শাড়ি সে কি করে পরবে ভেবে পায় না। অথচ তারও লজ্জা নিবারণের জন্য আরেকটি শাড়ি প্রয়োজন। এ গল্পে বরু বিবির উক্তির মাধ্যমে গল্পকার সন্তানের জন্য দরিদ্র মায়ের অন্তর্যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অপরিমেয় দুঃখচিত্রের গল্পটি চিত্তাকর্ষক ও শিল্পনিপুণ।

'থুথু' গল্পের মূল চরিত্র দুটোই তৎকালীন সময় শাসিত। এ গল্পে মনসুর পাঁচক হলেও বুঝতে পারে ইংরেজ পাদ্রী জোহানেস এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে। দেশ ও দশের শত্রু মনে করে সে জোহানেসের খাবারে তার থায়োসিস মিশ্রিত থুথু মিশে দেয়। একজন চাকরের মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হওয়া বিচিত্র, যদিও এটি প্রতিশোধ গ্রহণের বিকৃতপন্থা ও নেতিবাচক প্রতিবাদ। তবুও কলোনিয়াল সমাজের সংকীর্ণচিন্তা এ দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *জুনু আপা ও অন্যান্য* গল্পগ্রন্থে গ্রাম নদীর পটভূমিকায় নর-নারীর সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিচ্ছেদ, সঙ্কট, সংঘাত এবং তাদের প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব সংগ্রামের গৌরবময় জীবনাভিজ্ঞতা শিল্পরূপ লাভ করেছে। *জুনু আপা ও অন্যান্য* গল্পগ্রন্থের 'জুনু আপা' গল্পে বাঙালি নারীর ব্যর্থ ইতিহাস, ব্যর্থ দাম্পত্য

জীবন, যৌনজীবন ও ব্যর্থপ্রণয় কাহিনি এবং তাদের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনচেতনা 'জুনু আপা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে। 'জুনু আপা' শওকত ওসমানের প্রথম বয়সের রচনা। একজন প্রাণোজ্জ্বল তরুণীকে একজন সংসার অনভিজ্ঞ কিশোর যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে তারই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পথের পাঁচালি'র অপু যেমন সংসারকে, প্রকৃতিকে তার নিজের গ্রাম, নদী, লতাপাতায় ঘেরা চিরচেনা জগৎকে অপার বিস্ময়ে দেখত, তেমনি 'জুনু আপা' গল্পের কথক সেলিমও নিজের পরিবেশ ও পরিজনকে দেখেছে এবং আবিষ্কার করতে চেয়েছে তাদের রহস্য। 'জুনু আপা' গল্পে গল্পের কথক সেলিমের বাড়িতেই থাকত জুনু আপা। তার দূর-সম্পর্কীয় খালাতো বোন হতো সে। সেলিমেরই চাচাতো ভাই জসীমের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু চাচি ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিলে মোটা অঙ্কের যৌতুক পাবে, তাই জুনুর সঙ্গে জসীমের বিয়েতে সায় দেয়নি। তার বাধা ও বিরোধিতা অবশেষে দুজনকে পৃথক করে দেয়। অন্যত্র বিয়ে হলেও দুশ্চরিত্র স্বামীকে জুনু নিজেই তালাক দেয়। খালা-খালুর কটু কথা সহ্য করতে না পেরে একদিন সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপর সাত বছর নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এক পৌঢ় লোক মালেক সাহেবের সঙ্গে এক ভগ্ন রাজপ্রাসাদে তার সন্ধান পাওয়া গেল–

> বিজন অরণ্য মনে হয় গ্রাম। আশ-পাশে কোন বস্তি নেই। মাঠের পর মাঠ, বক্ষ-জোড়া ক্ষুদ্র বন-সহ ধূ ধূ করছে নির্ব্বাসিতের জীবন জুনু-আপার। এই জানালায় দাঁড়িয়ে জুনু-আপা হয়ত কত চোখের পানি ফেলে। কেউ সাক্ষী থাকে না তার। বন্ধ্যা, ধূসর-মরু জীবন। অথচ এই জীবনে কত কিছু না বিকাশের সম্ভাবনা ছিল।[৩]

নারী হৃদয়ের অকথিত বাণী নিয়ে যে গল্পটি সর্বাপেক্ষা পাঠককে আকর্ষণ করে তা হলো 'জুনু আপা'। 'জুনু আপা' চরিত্রে কিছু মিল পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের অন্নদা দিদির সঙ্গে। নদী কাউকে নতুন আশাভরা জীবন দান করে, আবার নদীর সাথে সংগ্রামে হেরে গিয়ে কেউ হয় বাস্তুহারা। ঝড় বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিরন্ন মানুষের জীবনের বাঁককে পরিবর্তন করে কিভাবে নতুন বাঁকে নিয়ে যায়, তা লেখক তুলে ধরেছেন 'নতুন জন্ম' গল্পে মাঝি ফরাজ আলী ও তার পুত্র আক্কাসের সংগ্রামকে অবলম্বন করে। এ গল্পটিতে দেখা যায়-দূরন্ত দুর্বিনীতা গোমতী নদীর সঙ্গে ফরাজ আলী ও তারপুত্র আক্কাস আলীর অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে উঠে। পিতা-পুত্র দুজনে নদীতে মাছ ধরে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু নদী তার স্বভাবের দোষে মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। কখনো কখনো বন্যায় ভাসিয়ে নেয় তার দুই তীর। কখনোবা ঝড়ে বিপর্যস্ত করে তোলে জনজীবন। ফরাজ আলীর এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে মূল্য না দিয়ে গোমতী তার স্বভাবজাত ভঙ্গীতে অসহায় পিতা-পুত্রের ভিটে প্লাবিত করে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী যখন ফরাজকে বলে– 'চলেন মিয়া চইলা যাই এহান থেইক্যা।' তখন সে নির্বিকারে গোমতির দিকে ইঙ্গিত করে বলে– 'যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত আর কোথাও মন লয় না।'[৪]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতা-পুত্র দুজনেই ভিটে ছেড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে শহরে যাত্রায় বাধ্য হয়। 'নতুন জন্ম' গল্পের ফরাজ আলী চরিত্রটি নদী বিধৌত সংগ্রামশীল মানুষের আশাবাদী অস্তিত্বের প্রতীক। গোমতীর তীব্র প্লাবনকে উপেক্ষা করে একদিন ফরাজ আলী প্রথমে বাঁধে আশ্রয় নেয়। নতুন জীবনের অন্বেষায় শহরে যাবে

বলে সে অপেক্ষা করে বাঁধের ওপর নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়। জীবন সম্পর্কে এই আশাবাদী চৈতন্য এই পর্বের গল্পে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মধ্যদিয়ে লেখক সামাজিক অসঙ্গতি, ব্যাভিচার আর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'হুকুম নড়েনা' গল্পে এক নিঃসন্তান দম্পতির আর্তি বিধৃত হয়েছে। পালিত সন্তানের পিতৃত্বজনিত সমস্যা এবং বিবাহক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি মৌল বিষয়রূপে উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পে। 'মাজেজা' গল্পটিতে কৌতুকের সংস্পর্শে সামাজিক ভণ্ডামিকে গল্পকার মোস্তফা খান নামক একজন উকিল চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মোস্তফা খান ভোট পাওয়ার জন্য দাড়ি রেখে নিজেকে পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লেখক এখানে গ্রামাঞ্চলে ধর্মের নামে যে ভণ্ডামি ব্যবসা প্রচলন রয়েছে তা কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে মোস্তফা খান চরিত্রের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। 'ভাগাড়ে' গল্পে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং শোষকের দানকে ভাগাড়ে নিয়ে গ্রামবাসীরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যে মনসুর আলী গ্রামবাসীকে ভাতের কষ্ট দিয়েছিল, সে আজ চারটি গাভী কোরবানি দিয়ে প্রায়শ্চিত্য করতে চায়, কিন্তু গ্রামবাসীরা তার দান গোশত প্রত্যাখ্যান করে শুধু অপমানই করেনি, ক্ষোভ প্রদর্শন করে ভীতির সঞ্চার করেছে। 'বকেয়া' গল্পে পাচু চরিত্রের মধ্যদিয়ে গল্পকার উন্মুলিত হয়ে যাওয়া বিপন্ন অস্তিত্বের স্বরূপ নির্মাণ করেছেন। 'তিনপাপী', 'খোওয়ার', 'দেনা', 'বিবেক' প্রভৃতি গল্পেও শওকত ওসমান নিম্নতর চরিত্র তথা গ্রামের বঞ্চিত, নিরন্ন অস্তিত্ব সংকটাপন্ন, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নিরন্তর সংগ্রামরত মানুষকে তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমান জীবনের সত্যদর্শী রূপকার। সময় ও দেশকালের রূপান্তরশীল অনুষঙ্গে তাঁর শিল্প ভাবনারও হয়েছে বিবর্তন। বাংলা গ্রামীণ জীবনাভিজ্ঞতা শওকত ওসমানের শিল্প-মানস নির্মাণে সক্রিয় থেকেছে। তাঁর ছোটগাল্পিক মানস-উৎস সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তিটি লক্ষণীয়–

> সে (শওকত ওসমান) লিখত সাধারণ মানুষের কথা। গ্রামীণ যে দুর্দশার মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে সেই দুর্দশার পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে সে দেখতে চাইতো। এদের মধ্যে কৃষক ছিল, জননী ছিল, জমিদার ছিল, মাঝি ছিল, মহাজন ছিল এবং বারবনিতাও ছিল। সকলকেই সে মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা পেয়েছে।[৫]

সময়ের পরিবর্তনে, সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সাথে শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয়ে যেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তেমনি তা পেয়েছে এক নতুন মাত্রা। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলোতে (১৯৫৮-৭০) স্বাধীনতাপূর্বকালে আইয়ূবী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীন চিন্তার মত প্রকাশের অধিকার এবং প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন রূপক ও প্রতীকি চরিত্র। সরকারের প্রতি বিদ্রূপ-বিদ্বেষকে তিনি সাহিত্য-শিল্পে রূপ দিয়েছেন। ফলে কোথাও কোথাও প্রতীকের একমাত্রিকতা, সংকেতের দ্বিমাত্রিকতাকে ছাপিয়ে স্থান করে নিয়েছে রূপকের বহুমত্রিকতা। যেমন: 'শিকার' গল্পে মৃত্যুর প্রাক্কালে শিকারী তাজু খানের উক্তি– 'The murderer is murdered thus– খুনীরা এই ভাবে খুন হয়।'[৬] ষাটের দশকের সামরিক স্বৈরশাসনের যে যাত্রা শুরু হয়, তার পরিচয় ও পরিণতি তিনি এ উক্তির মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। 'দুই মুসাফির' গল্পে ষাটের দশকে শোষক সরকার যে নিপীড়ন করে, জুলুম করে, মৃত্যুর পর সে শাসককে মানুষ আর মনে রাখে না– এটিই লেখক রূপকায়িত করেছেন, দুটি মৃত চরিত্রের প্রসঙ্গ এনে। 'ভ্রুণাঙ্ক' গল্পে একটি মানব ভ্রুণাঙ্কের পৃথিবীতে আগমনের ব্যাকুলতা ও বিরুদ্ধ পরিবেশ উপস্থাপিত হয়েছে। অবিবাহিত হাবিব ও

রাফেজার প্রণয়জাত গর্ভস্থ ভ্রূণ যেন ভূমিষ্ঠ হতে না পারে, সেকারণে আত্মীয়রা অবৈধ বলে তাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে। মূলত এ গল্পে লেখক ষাটের দশকের বাংলাদেশ ও তার জন্মপূর্ব কালকে চিহ্নিত করেছেন। যেখানে বাঙালিমনের স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আকুতিকে একটি মানব ভ্রূণাঙ্কের রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'প্রস্তরফলক: একটি রাগিনী' গল্পে দেখা যায় প্রতীকি চরিত্র প্রতিমা একজনকে ভালবাসে কিন্তু আর এক বর্বর তাকে গায়ের জোরে ভোগ করতে চায়। তখন সুযোগ বুঝে 'মিয়া সাহেব' নামের লোকটিকে প্রতিমা খুন করে। এই রূপক চরিত্রের ও গল্পের মধ্যদিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, তৎকালীন সামরিক সরকার এদেশের মানুষের উপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দিলে কী হবে? এ দেশের একটি মানুষও তা ভালভাবে গ্রহণ করেনি। মূলত এই প্রতিমা তৎকালীন অত্যাচারিত দেশ মাতৃকারই অবয়ব। এ গ্রন্থের "গোরনিদ্রা" গল্পেও লেখক রূপকের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন– 'ঘুমন্ত স্বদেশ' হচ্ছে পূর্ববাংলা, 'শব' হলো প্রাণবান বাঙালি, আর শবযাত্রীরা হলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এ গ্রন্থের গল্পগুলো রচিত হয়েছে ঢাকা মহানগরী ও তার আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও নগরকে কেন্দ্র করে। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল প্রধানত গ্রামভিত্তিক, মানুষের জীবনপ্রবাহ ছিল মন্থরগতির এবং তাতে পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে ধীর গতিতে সমাজচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু বিশ শতকে এসে গ্রাম ও শহরজীবনে পরিবর্তনের নতুন মাত্রা সূচিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির উপর দ্রুত গতিতে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরমুখো হয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে হাট-বাজার-শহর-বন্দর। অন্যদিকে বড় শহরগুলো আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং শহরগুলোতে অধিক সংখ্যক অফিস-আদালত, কল-কারখানা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এসময় যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায়ও উন্নতি সাধিত হয়। শহরের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভিবাসনের কারণে তাঁর এই দৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পীর দায়বদ্ধতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। 'শহর বাড়ছে লোক আসছে'– এই প্রসঙ্গগুলো পাই তাঁর *টুলেট*, *পিতা-পুত্র*, *গন্তব্য*- এসব গল্পে। *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'নেত্রপথ' গল্পে বাঙালি মুসলমান জীবন রূপায়ণের মধ্যদিয়ে সত্তাসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে–

> শীতের দিনে রবিবার বা অন্য কোন ছুটি থাকলে আর ঘরে মন বসত না। এককাল সত্যি এইভাবে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম। অবিশ্যি কোন সফরে নয়। শহরতলী ছাড়িয়ে কোথাও পায়ে হেঁটে ঘুরে আসতে পারলেই মন শান্ত হয়ে যেত।[৭]

মূলত মধ্যবিত্তের আত্মসমালোচনা এ গল্পে ফুটে উঠেছে। 'জনারণ্য' গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বৃত্তান্ত, সমাজকে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সূত্রগুলো বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। *উপলক্ষ্য* গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'দুই মোনাজাত', 'দম্পতি', দাওয়াই ইত্যাদি গল্পের মধ্যেদিয়েও ছয় দশকের বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্ব রূপায়িত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রচিত গল্পে লেখক দেখাতে চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুসঙ্গ ও যুদ্ধোত্তর সমাজের বাস্তবতা। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গল্পগ্রন্থে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। এ গ্রন্থের 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের ঘটনা উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধের জবানীতে আবেগসিক্ত গীতল ভাষায় একাত্তরের সেই আতঙ্কজনক পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তানি হায়েনাদের ভয়ে সমস্ত গ্রামবাসী নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও বৃদ্ধ একাকীই গ্রামে থেকে যায়।

কিন্তু রক্তলোলুপ বর্বরদের পৈশাচিকতা থেকে এই অশীতিপর বৃদ্ধও রেহাই পেল না। তার অন্তিম উচ্চারণের মধ্যদিয়ে বিম্বিত হয়েছে লেখকের দুর্জয় আশাবাদ–

> নেকড়ের পালে পড়ে আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে গেছি বাইরের জগতে। আমার মুঠি হাত, দ্যাখো, দ্যাখো, তুমিও দুশমনকে আঘাত দিতে হাত মুষ্টিবদ্ধ করো। একটু দাঁড়াও। দেখে যাও, জন্ম যদি তব বঙ্গে।[৮]

এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'কেন মৌন' গল্পটি একাত্তরের পটভূমিকায় রচিত। এ গল্পের মোবেদ মজুমদার চরিত্রটি বাস্তববোধে উজ্জ্বল। পাকিস্তানি আগ্রাসনে সমগ্র দেশ যখন পদদলিত, মোবেদ মজুমদার তখনও তার ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত। গল্পকার চরিত্রটিকে একটি শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে বেগম মজুমদার সন্তানবৎসল, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনায় মজুমদার সাহেব ও বেগম মজুমদার গোপনে অর্থ তুলে দেন আগন্তুকের হাতে। মোবেদ মজুমদারের ছেলে জহির চরিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। জহিরের আত্মমগ্ন গ্রন্থপ্রিয় চেতনার অগ্নিস্পর্শে শুদ্ধ হয়ে সে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়। লেখক এক নিঃশব্দ আবহে জহির-চরিত্রকে বিন্যাস করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন আতঙ্ক ও ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদে লেখক এই চরিত্রকে এক সংলাপহীন নিস্তব্ধতার পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' গল্পে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচারে হত্যা, লুট, অগ্নিদাহ, ধর্ষণের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রমনীর চিৎকার, আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা, প্রাণভীত মানব-মানবীর দৌড়, বেয়নেটে গাঁথা শিশু, মেশিন গানের খটখট রব-নারকীয় তাণ্ডবের নানা অধ্যায়।[৯]

'দুই ব্রিগেডিয়ার' গল্পে ২৫ মার্চ রাতে কর্তব্যরত ফায়ার ব্রিগেডকর্মী সয়ীদ ভূইয়ার আগুন নেভাতে গিয়ে শহিদ হবার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত লেখক '৭১ এর নির্মম বাস্তবতার ছবি আন্তরিকতার সাথে এঁকেছেন। *তিন মির্জা* গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'তিন মির্জা'য় বৃটিশ যুগে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে মির্জা পরিবারের কাহিনীর মধ্যদিয়ে বর্ণিত হয়েছে ঐ কালের এক নির্মম ইতিহাস। *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গল্পগ্রন্থের 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে একজন সাধারণ মানুষ নিজের মধ্যে কিভাবে ঈশ্বরকে খুঁজে পায় তার শিল্পরূপ নির্মিত হয়েছে। এ গল্পে লেখক অনেক বেশি সাহসী। এ গন্থে লেখকের বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। শওকত ওসমান তাঁর প্রতিটি গল্পে একটি নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিলো মাদ্রাসা থেকে আর শেষ হয়েছিল কলকাতার শিক্ষা দিয়ে। মাদ্রাসায় পড়াকালে তাঁকে আরবি-ফার্সি শিখতে হয়েছে। ভারতীয় এলাকায় থাকায় হিন্দি শিখতে হয়েছিল। এই ভাষারীতির মিশ্রণ তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য– 'আল্লার দোওয়ায় সাত আট বছরে ছেলেমেয়ে জওন হোয়ে গেলেত খুব মুশকিলে পড়বে।'[১০] হিন্দি, আরবি, ফার্সি, বাংলা ছাড়াও তিনি তাঁর গল্পে অপভাষার ব্যবহার করেছেন– 'একবার হুকুম দিন না। শালার মাথাটা একদম বাইন মাছ ছেঁচা করে দিই।'[১১]

শওকত ওসমান তাঁর বেশিরভাগ চরিত্রের বেলায় 'খান' পদবিটি দিয়েছেন। পশ্চিমা 'খান'দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এ কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। যেমন : তাজু খান (শিকার), শের আলী খান, কতলু খাঁ ইত্যাদি। তিনি প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে গল্প রচনা না করলেও কোনো কোনো গল্পে কখনো কখনো তাঁর তুলির

আঁচড়ে প্রাকৃতিক আবেশ সৃষ্টি করেছেন– 'গ্রীষ্মের দাবদাহ সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। এই রুক্ষতার সৌন্দর্য বৈরাগীর মনের রঙের মত।'[১২] বিদ্রূপ ও কৌতুক তাঁর গল্প রচনার অন্যতম কৌশল। গল্পে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তা আসে শেষে একটি বিদ্রূপাত্মক বাক্য দিয়ে। বিষয়েও নতুনত্ব আনেন যেমন: 'উদবৃত্ত' গল্পের পরিণতি তীব্র শ্লেষময় ও বিদ্রূপাত্মক– 'আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না... সে তো বস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে রোজই দেখে ঘন্টার পর ঘণ্টা।'[১৩] এই বাক্যটি গল্পের শুরুর বাক্য– 'আল্লায় যেন তরে দ্যাহে'– এর ironical জবাব। এরকম irony আরও অনেক গল্পে দেখতে পাওয়া যায়। শওকত ওসমানের ছোটগল্প কালের বিচিত্র জিজ্ঞাসায় এবং জীবনের নানা উত্তাপে ঋদ্ধ হয়েছে। নানা চরিত্রের উজ্জ্বল পদপাতে তাঁর গল্পের ভুবন সমাকীর্ণ।

> চরিত্র নির্মাণ প্রশ্নে শওকত ওসমান রূপান্তরশীল ও ক্রমবিকাশধর্মী। প্রথম পর্যায়ের চরিত্র সমগ্রে বিদ্যমান আবেগময়তা ক্রমশ পরিশীলিত হয়েছে নাগরিক মননে। মানবিকতার নিরঙ্কুশ উদ্ভাসনে তাঁর গল্পের চরিত্র সার্বজনীন। বিচিত্র পেশা ও প্রবৃত্তির এবং নানা শ্রেণির মানুষের কোলাহলে তাঁর গল্প মুখরিত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো শাশ্বত মানবিকতার অমলিন দ্যুতি।[১৪]

বিষয়বস্তু জীবনদর্শন ও শিল্প-প্রকরণে এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী হলেন শওকত ওসমান। জীবন রূপায়ণে শওকত ওসমান আধুনিক। 'আমাদের আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ ও বাতিঘর।'[১৫] শওকত ওসমানের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাপকতা। জীবনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ের অর্জিত অভিজ্ঞতার সমীকরণ ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর ছোটগল্প সমুন্নত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ব্যঞ্জিত ফসল।

> জীবনের গভীরতায় তাঁর গল্পে অবলীলায় উঠে এসেছে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তির পদতলে নিস্পিষ্ট সমাজ ও মানুষ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পে ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিপীড়ন, নারীনিগ্রহ ও নারী নির্যাতন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে পরিস্ফুটিত।[১৬]

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান একটি উজ্জ্বল নাম। শওকত ওসমান কথাসাহিত্যে তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্পদৃষ্টিতে বিশিষ্ট। তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয়-নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা ছোটগল্পে একটি পৃথক আসন দান করেছে। জীবনচলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবনের অসংখ্য চিত্র, সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিকরূপ ধারণ করেছে। তাঁর ছোটগল্প জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়কে আত্মস্থ করেছে। সন্ধানী পরিব্রাজকের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন। জাতীয় চেতনাবোধ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনবোধ থেকে উদ্ভাবিত প্রতিভা এবং তা প্রয়োগের সঠিক কৌশল, যেমন তাঁর প্রাগসর জীবনচেতনাকে প্রতিভাসিত করেছে, তেমনি তাঁর গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে। আর বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রায়ণের কৌশল, স্বতন্ত্র ভাষারীতি এবং উপস্থাপনার সাবলীলতার কারণে শওকত ওসমানের গল্পগুলো হয়ে উঠেছে শিল্পসফল ও শিল্পসমৃদ্ধ।

তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ রফিক, *শওকত ওসমান : নাগরিক মননশীলতায় ধীমান*, নিসর্গ, শওকত ওসমান সংখ্যা, বগুড়া, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ৭৯

২. বুলবুল ওসমান, *ভূমিকা*, *গল্পসমগ্র : শওকত ওসমান*, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৩, পৃ. ২৪

৩. শওকত ওসমান, *জুনু আপা*, গল্পসমগ্র, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ১৩৯

৪. শওকত ওসমান, *নতুন জন্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৫, সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৯

৬. শওকত ওসমান, *শিকারী*, গল্পসমগ্র, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ২৪২

৭. শওকত ওসমান, *নেত্রপথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৮. শওকত ওসমান, *জন্ম যদি তব বঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫

৯. শওকত ওসমান, *বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

১০. শওকত ওসমান, *উভয়সঙ্গী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

১১. শওকত ওসমান, *দুই মুসাফির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

১২. শওকত ওসমান, *দুই মুসাফির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

১৩. শওকত ওসমান, *উদবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

১৪. চঞ্চল কুমার বোস, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : চরিত্র-চিত্রণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সম্পাদক : নূরুর রহমান খান, সংখ্যা: ৬৪, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ৪০

১৫. হুমায়ুন আজাদ, *কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ শওকত ওসমান*, রোববার, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ, ৩১

১৬. শিরীন আখতার জাহান, *শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক*, Dhaka University Institutional Respository, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৯